শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আছিয়া খালা
ভূমিহীন দিনমজুর শহীদ এক দম্পত্তির আত্মত্যাগের কাহিনী
- মুক্তিযোদ্ধা ডঃ মহসিন আলী

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে কত হাজার সরাসরি যুদ্ধকরা মুক্তিযোদ্ধা আছে, কত লাখ বাঙালি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ও কত কোটি আপামর জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে তার কোন হিসেব নেই। আজো তার হিসেব কেই করেনি এবং কোনদিন তাদের কোন হিসেব হবেও না। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ছাড়া আর কারো নাম কোন তালিকায় উঠেনি। জাতীয়, আঞ্চলিক বা স্থানীয়ভাবেও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি অজানা পরিচিত অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধা, সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা ও সাহায্যকারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ করে এরকম লাখ লাখ জীবত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহ করে তালিকাভুক্ত করা।
মহান মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ৩৬ বছর পরে অজানা লাখো জীবিত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা যে অজানা কত করুণ, নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছে তাদের সাহসী বীরত্বপূর্ণ এইসব কাহিনী ও ছোট ছোট খন্ড খন্ড ইতিহাস আজ নীরবে অজানাই থেকে যাচ্ছে এবং নিভৃতে তা যাচ্ছে হারিয়ে। অন্য দিকে আবার অনেক অমুক্তিযোদ্ধা এমনকি স্বাধীনতা বিরোধীরা বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীন সরকারী দলসমূহের সহযোগীতায় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নাম উঠিয়ে বা মিথ্যা মুক্তিযোদ্ধা সেজে সরকারী ক্ষমতা খাটিয়ে বহু অনৈতিক কাজ করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মত রাতারাতি ধনী হয়েছে। লুটতরাজ, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতিসহ সকল প্রকার আইন, শান্তি ও মানব বিরোধী কাজ করে এই সব তথাকথিত ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা ও ১৬ ডিভিশন নামক সুখের পায়রা মিথ্যা মুক্তিযোদ্ধা নামক শয়তানেরা বাংলাদেশকে খাচ্ছি খাবি করে চুষে চুষে খাচ্ছে। অথচ যাদের রক্তে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের কোন খোজ যেমন কেউ নেয়না- তাদের মনেও এখন কেউ করে না। বাংলার গ্রামে গঞ্জে শহরে লাখ লাখ আত্মত্যাগী নারী পুরুষ কৃষক মজদুর নীরবে অকাতরে দেহের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। অথচ তাদের পরিচয় খুঁজে বের করার কেই নেই এখন। তাদের রক্তে পাওয়া স্বাধীন বাংলাদেশকে সবাই শুধু লুটে লুটে খাবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দেশ ও স্বাধীনতা বিরোধী এইসব হায়নাদের হাত থেকে বাংলাদেশ যেদিন মুক্তি যাবে সেদিনই লাখো লাখো জানা অজানা শহীদি আত্মা শান্তি পাবে। আর সে জন্যই আমাদের মত এখনো যারা জীবিত মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে তাদের বাকী জীবনটা কাজ করে যাওয়া উচিত যেন আমরা আমাদের জানা মতে সে সব অজানা অচেনা বীর মা বোনসহ মুক্তিযোদ্ধারা অকারণে প্রাণ দিয়েছে তাদের পরিচয় খুঁজে বের করে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে যেতে পারি।
আজ আমি এমনই এক অজানা অচেনা দরিদ্র ভূমিহীন দিনমজুর এক গরীব দম্পতির ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করব। ধনী, বড়লোক, খ্যাত শিক্ষিত ও বড় নেতাদের এক ফোটা রক্ত ঝড়লে তা তো সারা দেশে রেডিও টিভি ও খবরের কাগজের পাতায় প্রচার করা হয় ফলাও করে। অথচ গরীব দিনমজুরের বাড়ীশুদ্ধ সকলেই দেহের সকল রক্ত ঢেলে দিলেও তা বুঝি আসে না কারো নজরেও এবং মন ও হৃদয়েও স্পর্শ করে না। তারা ত্যাগ তিতীক্ষা, নির্যাতন সহ্য করতে করতে মৃত্যুর মুখে ঢলে পরলেও যেন কারো চৈতন্যে স্পন্দন দেয় না। বিবেককেও আঘাত করে না। এমনই লাখো অজানা গরীব মেহনতি মানুষের ঝরা রক্তের নদী মহাসমুদ্র হয়ে এই প্রিয় বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে।
তৎকালীন বৃহত্তর রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার (বর্তমান নাটোর জেলা) গুরুদাসপুর থানার বিচ্ছুবাহিনীর ভারতের মুর্শিবাদ থেকে বিশাল বিস্তৃত পদ্মা নদীসহ লালপুর, বাগতিপাড়া, নাটোর, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর, চাটমহর, তাড়াশ ও সিংড়া থানাব্যাপী বিশাল চলনবিল এলাকায় ছিল বিচরণ। এই সব এলাকায় শত শত বাড়িতে আমাদের বিচ্ছুবাহিনীর সদস্যদের ছিল গোপন আশ্রয়। বেশীরভাব আশ্রয়দাতাই ছিল গরীব। কেউ কেউ ছিল ঝুলি হাতে নিয়ে ভিক্ষা করা ফকির। এমন কি লাঠি ভর করে চলা পঙ্গু ফকিরও দিয়েছে আমাদের আশ্রয়। ভাঙ্গা ছনের ঘরে চৌকিতে বা চৌকির নীচে আমাদের থাকার জায়গা দিয়ে তারা প্রায়শই বাহিরের বারান্দায় থাকত। এমনই এক ভূমিহীন দিনমজুর গরীব নিঃসন্তান দম্পত্তি গুরুদাসপুর থানার মশিন্দা ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের এন্তাজ মিয়া। তার এক চোখ অন্ধছিল বলে তাকে এলাকায় সবাই এন্তাজ কানা বলেই ডাকত। সে কখনো রাগ করত না। জন্মগতভাবে না হলেও যৌবনের এক পর্যায়ে এসে ভূমি মালিকের কাজ করতে যেয়ে এক দুর্ঘটনায় তার এক চোখে

আঘাত লাগে এবং সুচিকিৎসার অভাবে তার চোখটি শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য সে চিকিৎসার খরচ ও কোন ক্ষতিপূরণ কখনো পায়নি। বরং ভূমি মালিকের ধিক্কার ও ভৎর্সনাই তাকে সহ্য করতে হয়েছে। আর এই ভূমি মালিকই ব্যাঙ্গ করে তাকে এন্তাজ কানা বলে ডাকা শুরু করে এবং সব সময়ই তাকে কানা বলে উপহাস করত। আর তখন থেকে গ্রাম ও এলাকার সবাই তাকে এন্তাজ কানা বলে নতুন ভাবে চিনতে লাগল ও এন্তাজ কানা বলেই তাকে সবাই ডাকতে শুরু করল। এন্তাজ মিয়া তার এই নতুন নাম ও পরিচয় অতি সহজেই মেনে নিয়েছিল। তবে লোকে যখন তাকে এন্তাজ মিয়া না বলে এন্তাজ কানা বলে ডাকে তখন তার মনে এই ঘুনে ধরা সমাজের ধনী গরীবের আকাশ পাতাল বৈষম্য, গরীবের উপর ভূমি মালিকদের অত্যাচর নির্যাতন, অবহেলা ও জীবন নিয়ে উপহাসের ব্যবহার দেখে এই সমাজের প্রতি তার শুধু এক রাশ ঘৃণার উদ্রেক হত। হৃদয়ের গভীরে সব ঘৃণা গোপন রেখেই সে সব সহ্য করে চলত।

যৌবনের এক পর্যায় এসে এন্তাজ মিয়ার বিবাহেরও সমস্যা হয়েছিল। এক দিকে গরীব, দুঃস্থ দিনমজুর ভূমিহীন। ভাঙ্গা এক কুঁড়ে ঘরে যার বাস, অপর দিকে একচোখ অন্ধ বিধায় কানা এন্তাজ বলে যার সারা এলাকাতে পরিচিতি, সবার মুখে ব্যাঙ্গ করার এই পাত্রের সাথে কে'ইবা মেয়ে বিয়ে দিবে। ধীরে ধীরে তার বয়সও বেড়ে চলল। বিয়ের বয়সও প্রায় শেষের দিকে। তবুও তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে না। দুঃশ্চিন্তায় অনেকটা মুছরে যায় এন্তাজ মিয়া। রাতদিন ভূমি মালিকের দিনমজুর খেটে আর সে শান্তি পায় না। তাই মাঝে মাঝে বিষণ্ন হয়ে ঘরে একা একাই শুয়ে থাকে কাজ বাদ দিয়ে। তার যেন আর কোন ভবিষৎ নেই বুঝি। বিমর্ষ হয়ে কাজে যেয়েও তার কাজে মন বসে না। এজন্য জ্যোতদারের নিকট থেকে অনেক গালাগালি শুনতে হয়েছে তাকে। অনেকদিন তার কোন মজুরিও দেয়নি জোতদার। তবুও ঝগড়া বা প্রতিবাদ না করে সে মেনে নেয় নীরবে।

জীবনের এমনই এক চরম সন্ধিক্ষণে এক দুসম্পর্কীয় আত্মীয়ার মাধ্যমে অনেক দূরের এক গ্রামের এক মেয়ের খোঁজ পেল এন্তাজ মিয়া। মেয়েটির নাম আছিয়া। আছিয়াকে সে কখনো দেখেনি ও তার পরিচয়ও তার জানা নেই। তবে তার দুসম্পর্কের আত্মীয়ার মাধ্যমে সে জানতে পারে যে আছিয়ার বিয়ে হচ্ছে না অনেকদিন থেকে। আছিয়ার বয়স অনেক হয়েছে। মেয়েটিও এক চোখ অন্ধ। জন্মের কিছুদিন পরেই তার পোলিও জাতীয় রোগে আক্রান্ত হলে সুচিকিৎসার অভাবে তার এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শিশু বয়স থেকে একটি চোখ হারিয়ে গরীব দিনমজুর বাপমার ঘরে সে বড় হয়েছে। গরীবের এক চোখ অন্ধ মেয়ে হয়ে বড় হতে থাকলেও তার বিবাহের কোন ব্যবস্থা তার বাপ মা করতে পারে নি। বাপমার ঘরে ধীরে ধীরে তার বয়স অনেক হয়ে বিয়ের স্বাভাবিক বয়স পেরিয়ে গেছে। গরীব বাপ মাকে একজন মেয়ে হয়েও আছিয়া একজন ছেলের মতই সে সংসারের সকল কাজ করত। রান্না বাড়া থেকে শুরু করে মাকে ঘরের সকল কাজে সাহায্য করা ছাড়াও অপরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ ও বাপের সাথে অনেক কৃষি কাজেও সে সাহায্য করে আসছে। বাপে যখন জোৎদারের কাজের চুক্তি নিত তখন বাপের সাথে সে জমিতে যেয়ে ফসল লাগানো, ঘাস নিড়ানো, লাঙ্গল দেয়া ও ফসল কাটার মত সকল কাজই সে বাপের সাথে করত। এজন্য তাদেরকে অনেক অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। মেয়েকে অনেক অসভ্য ভাষায় গ্রামের লোকদের কাছ থেকে গালাগাল শুনতে হয়েছে। অনেক গ্রাম্য শালিশও বসেছে। মেয়ের বাপকে অনেকবার শালিশ করে অনেক মারধরও করা হয়েছে অনেকবার।

যৌবনবতী মেয়েকে দিয়ে কৃষি কাজ করিয়ে বেপর্দার কাজ করেছে। ইসলাম ধর্মের মর্যাদার হানি করেছে। মুসলমান থেকে তারা খারিজ হয়ে গেছে। অনেক সময় তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কটও করা হয়েছে। আবার গ্রামের ধনী বখাটে যুবক ও মাতব্বরদের কুনজরেও পড়তে হয়েছে এই পরিবারকে। এক অন্ধ মেয়েকে নিয়ে তার বাপ মা বহু কষ্ট নির্যাতন ও অত্যাচারের মাঝেও মেয়ের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন রাখার আপ্রাণ চেষ্টার পাশাপাশি মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। কোথাও কোন বিয়ের সম্পর্ক আসলেই তা ভেঙ্গে যায় বা শত্রুতা করে ভেঙ্গে দেয়া হয়। মেয়ে সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলে শত্রুরা। অনেকে আবার অনেক কিছু যৌতুকের দাবী করে না পেয়ে সরে যাচ্ছে। বাপ মা মেয়েকে দিয়ে মাঠে কাজ করাচ্ছে ও ব্যবসা করাচ্ছে এমন জঘন্য অপবাদ দিয়ে এই নীরিহ গরীব পরিবারকে যেন গ্রামের লোকজন সামাজিকভাবে বন্দি করে রেখেছে। আবার মেয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেও তাদের আইনে বা ধর্মে বাধে না। এমনই এক চরম বিপর্যয়ের মূহুর্তে আছিয়ার বাপমা ঐ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আছিয়ার নানা মামার বাড়িতে উঠল। নানার বাড়ি এসেও আছিয়ার বিবাহের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। গরীব নানা ও মামারা গ্রামের বাইরে অন্যান্য দূর গ্রামে পরিচিত লোকদের মাধ্যমে আছিয়ার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এখানেও একই রকম বাধা আসতে লাগল। বিশেষ করে মহা পাপ করে বাপমাসহ ভিটে ছেড়ে পালিয়ে এসেছে এক অসতি কুলঙ্গার মেয়ে। যেখান থেকেই

বিয়ের সম্পর্ক আসে সেখানেই এই অপবাদ। বারবার বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেউ আর এই এক চোখ অন্ধ গরীব অপবাদে জর্জড়িত মেয়েকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসছে না।

আছিয়া সম্পর্কে খবর আসার পর এন্তাজ মিয়া বেশ উৎসাহী হয়ে পরে। নিরাশ জীবনে সে যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায়। বিয়ের কথা মনে করতেই তার হৃদয়ে যেন স্পন্দন জেগে ওঠে। বয়স বেড়ে গেলেও একটি মেয়ের পক্ষ থেকে তার বিবাহের প্রস্তাব এসেছে এযেন তার আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার আশ্বাস। মধুর স্বপ্নেও মাঝে মাঝে অনাহারে অর্ধাহারে থাকা পেটেও সে যেন বিভোর হয়ে যায়। বিয়ের আগ্রহে সে তার দুসম্পর্কীয় আত্মীয়ার সঙ্গে সেই মেয়েকে দেখতে যায়। মেয়ে সম্পর্কে সে বিস্তারিত সবই আগেই শুনেছে। মেয়েটির বয়স তার কাছাকাছি। এক চোখ অন্ধ। দেখতেও একরকম শ্যামবর্ণ। এন্তাজ মিয়ার তাতেও কোন আপত্তি নেই। নিজের বিয়ের না হওয়ার যাতনা সে বুঝে। একজন পুরুষ হিসেবে এক চোখ অন্ধ হওয়ার জন্য তার এতদিন বিয়ে হয়নি। আর গরীবের এক চোখ অন্ধ মেয়ের যে বিবাহ সহজে হবে না তা সে ঠিকই বুঝে উঠতে পারে। মেয়ের অনেক দূর্ণামের কথা শুনলেও সে তাতে বিচলিত হয় না। গরীব মেয়ের প্রতি ধনীদের চোখ পরেই এবং ধনীরা দূর্ণাম করে গরীব মেয়েদের কব্জা করতে চাইবে এটাই জোতদার মাতাব্বদের চিরাচরিত স্বভাব। তাই এন্তাজ মিয়া বিয়েতে রাজি হয়ে যায়। মেয়ে ও তার বাপমা আত্মীয় স্বজন ও এন্তাজ মিয়া সম্পর্কে সব শুনেও এন্তাজ মিয়াকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। অন্তত মেয়েটির একটা ব্যবস্থা হবে। দুজনই কর্মঠ। তাই তারা দুজনে কষ্ট করে কোন মতে চলতে পারবে।

মেয়ে দেখে ফেরার পথে পাড়ার কিছু বখাটে ছেলে ও মাতাব্বরের লোকজন এসে এন্তাজ মিয়ার পথ রোধ করে ধরে এবং এই মেয়েকে বিয়ে না করার জন্য হুশিয়ার করে দেয়। মেয়ে সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বলে- তাকে আর এই গ্রামে না আসতে বলে দেয়। এন্তাজ মিয়া বেশ ভয় পেয়ে যায়। কোন মতে সে বখাটেদের হাত থেকে বেঁচে বাড়ি ফিরে আসে। তবে মেয়েটির প্রতি তার বেশ মায়া হয়ে যায়। মেয়ে ও পরিবারের করুন ইতিহাস শুনে সে তার নিজের জীবনের সাথে তা মিলিয়ে দেখে। তার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি ভাল আছে, ভীষণ লাজুক, অল্প কথা বলে। সে খারাপই হতে পারে না। এসবই সমাজ পতিদের অপপ্রচার। তাদের স্বার্থ উদ্ধার না হওয়ায় তারা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মেয়েটিকে ক্ষতি করতে চায়। এই জন্য তাদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। নিজের জীবনের উপর জোতদার মাতব্বারদের অত্যাচার নির্যাতনের কথা চিন্তা করে আছিয়ার পরিবারের প্রতি তার সহানুভূতি আরো গভীর হয়। সকল ভয় ভীতি উৎরায়ে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে সে এই মেয়েকেই বিয়ে করবে। এই মেয়েই তার জীবন সঙ্গিনী, তার সংসারের লক্ষ্মী। তার সুখের সংসার শুরু হবে। তাদের ঘরে ভবিষ্যৎ বংশধর আসবে। তার নাম রাখবে। এরকম বহু চিন্তা করতে করতে প্রতিরাতেই ঘুমিয়ে যায় এন্তাজ মিয়া। এই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য সে আরো উদগ্রীব হয়ে যায়। তার দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয়াকে সে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। আছিয়ার বাবার ও নানার গ্রামের লোকদের বাধার কারণে ঘটকের পাড়ায় এসে ঘটকের বাড়িতে তাদের শুভ বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। দূর থেকে দেখে এন্তাজ মিয়া আছিয়াকে নিয়ে যে সব চিন্তা করেছিল,তাকে যে স্বপ্নের সাথে তুলনা করত, বিয়ের পর তাকে কাছে পেয়ে আরো অধিক ভালো বলে ভাল জানতে শুরু করে। মেয়ের বিরুদ্ধে শোনা সকল অপবাদকে ভেঙ্গে, মেয়ের মধুর লাজুক ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়। শত কষ্টের মধ্যেও সে তার হতাশ জীবনের মূল্য খুজে পায়। সে যেন সত্যিই সুখের স্বর্গ খুঁজে পেয়েছে।

সারা জীবন ধিকৃত ও অনেক দুঃখ কষ্ট অত্যাচার নির্যাতন অপবাদ সহ্য করা জীবনে অবশেষে বিয়ে হয়ে আছিয়ারও যেন তার জীবনের মূল্য খুঁজে পেয়েছে। একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল পেয়েছে। তার বিবাহ হয়েছে। স্বামী পেয়েছে। তাকে আর কেউ অত্যাচার করতে পারবে না। কেউ আর তাকে কোন অপবাদ দিতে পারবে না। কেউ আর তার প্রতি কখনো কুনজর দিতে পারবে না। আল-াতায়ালা শুভ দৃষ্টি দিয়েছে তার উপর। আল-াহ রহমত হয়েছে তার প্রতি। এই স্বামীকে নিয়েই তার জীবন। এটাই তার আশ্রয়স্থল। তাই তার জীবনের সকল ভালবাসা সেবা যত্ন পরিশ্রম দিয়ে স্বামীকে খুশী করা নিজের সংসারকে নিজের মত করে সাজানো সব কিছুই সে মনোযোগ সহকারে করছে। ভাঙ্গা একটা ছনের ঘরে সে নিজের স্বপ্নের প্রাসাদ সাজাচ্ছে। বাড়ির সব কাজ করে বাড়িতে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে। স্বামী এন্তাজ মিয়া সকালে উঠে চলে যায় জোতদারের কাজ করতে আর সন্ধেয় ফিরে আসে। স্বামীর কষ্টের আয়ে তাদের সংসার চলছে একরকম। আছিয়া অধিক আয়ের জন্য ঝিয়ের বা অন্য কোন কাজ করতে চায়। স্বামী তা তাকে করতে দেয় না। সে লক্ষ্মী বউয়ের মত তাকে বাড়িতেই রাখতে চায়। অবশেষে বাড়ির আঙ্গিনাতে ঝোপ জঙ্গল কেটে আছিয়া শাক সবজীর বাগান করতে শুরু করে। ছাগল, হাঁস মুরগী গুরু পালন শুরু করে দেয়। এইভাবে

তাদের সংসারে অতিরিক্ত আয় আসতে থাকে। পরে সে স্বামীকে অন্যের বাড়ির কাজ ধীরে ধীরে কমিয়ে দিতে বলে। এইভাবেই তাদের দুজনের সংসার সুখেই চলছিল।

এদিকে বিয়ের প্রায় ১০ বছর হয়ে চলল, তাদের ঘরে এ পর্যন্ত কোন সন্তান এলো না। দুজনে বহু প্রার্থনা বহু মানত করেও তাদের ঘরে কোন সন্তান আসেনি। অনেক পীর ধরে অনেক অলি আল-াহর দরগাহতেও তারা ধর্ণা দিয়েছে। বহু কবিরাজ আয়ুর্বেদীও হোমিও ডাক্তারও দেখিয়েছে। তবুও কিছু হয়নি। সবাই মেয়েটিকেই দোষ দেয়। সে একজন বাজা মেয়ে। তার কোন সন্তান হবে না। সন্তান ধারণের ক্ষমতা তার নেই। গ্রামের সবাই শুরু করে তাকে উপহাস করা। ব্যাঙ্গ করে সবাই বলে কানার বউ কানী। তার উপর বাজা বউ। এ বউ বাড়ির অলক্ষ্মী। এমন কি গ্রামেরও অলক্ষ্মী। তাই গ্রামের লোকজন এন্তাজ মিয়াকে আবারো বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে। এই এক চোখ অন্ধ অলক্ষ্মী বাজা বউকে তালাক দিয়ে নতুন করে বিয়ে করার জন্য পরামর্শ দিতে থাকে। এন্তাজ সে সব পরামর্শ উড়িয়ে দেয়। সে জানে তারও এক চোখ অন্ধ বলে আগেতো কেউ তাকে বিয়ে দিতে পারেনি। এখন সংসারের অবস্থা একটু ভাল হয়েছে তাই তার পিছনে লেগেছে তার শত্রুরা তার সংসার ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। তার বউকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করার জঘন্য পরামর্শ দিচ্ছে।

পাড়ার লোকদের ব্যাঙ্গাত্বক কথায় বউও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সে কানা, বাজা, অসতী, অলক্ষ্মী আরো বহু অপবাদ দিয়ে রাতদিন তার কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। সে আর বাড়ির বাইরে যেতে পারে না পাড়ার মেয়েদের কথা জন্য। সব অপবাদ ঘাড়ে নিয়ে সেও তার স্বামীকে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। স্বামীর বংশধর রক্ষার জন্য তাকে আবারো বিয়ে করতে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু এন্তাজ মিয়া কিছুতেই দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হয় না। বউকে সে আগলে ধরে দত্তক রাখার চিন্তা করে। কিন্তু দত্তকই বা কোথায় পাবে। তাছাড়া এলাকায় পরিচিত কানাকানি বলে কোন ফকিরের সন্তানও তাদেরকে দত্তক দিবে না। তাই তারা দত্তক নেয়ার অবাস্তব চিন্তাও বাদ দিয়েছে। এন্তাজ মিয়ার প্রায় ষাটের কাছে ও তার স্ত্রীর প্রায় পঞ্চাশোর্ধর মত বয়স। জীবনের এই পর্যায় এসে তাদের আর জীবন ও বংশধর সম্পর্কে নতুন করে ভাবার অবকাশ নেই।

এমনি সময় শুরু হয় ১৯৭১ সালের রক্তঝরা মহান মুক্তিযুদ্ধ। চারিদিকে যুদ্ধ চলছে। গ্রামে গঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ। অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানী দালাল রাজাকার গঠিত হয়েছে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র করছে। এছাড়াও শান্তি কমিটি, মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর ক্যাডার বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধকে নস্যাত করার জন্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের এই মহা বিপ-বের মাঝে এন্তাজ মিয়া ও তার স্ত্রী যেন আবার নতুন করে তারুণ্য ফিরে পায়। মুক্তিযুদ্ধের জীবন মরণের মহা উল-াসে তারাও মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। এর পূর্বে ১৯৬৯ সালের ছাত্রজনতার ১১ দফার গণআন্দোলনে এন্তাজ মিয়া বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তার বউই তাকে মাঝে মাঝে পাঠাতো ১১ দফার মিছিলে। নীরেট গ্রামে বাস করলেও মাঝে মধ্যে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অনেক মিছিল হত ছাত্রজনতার। সেই সব মিছিলে এন্তাজ মিয়া তার বউয়ের উৎসাহেই যেত কখনো কখনো। তাছাড়া ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে এন্তাজ মিয়া ও তার বউ নৌকা মার্কার পক্ষে অনেক কাজ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই আমরা গুরুদাসপুর থানার বিচ্ছু বাহিনী নামে স্থানীয়ভাবে এক মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। বিচ্ছু বাহিনী গঠনের প্রাক্কালে আমরা স্থানীয়ভাবে কিছু পুলিশ, আনসার, ইপিআর, মিলিটারী সদস্যদের দিয়ে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করি এবং বিভিন্ন গ্রামে যুবকদের আহবান জানাই এই প্রশিক্ষণে যোগদানের জন্য। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ হলে আমরা কিছু কিছু উৎসাহী যুবকদেরকে ভারতে প্রশিক্ষণে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। ভারতে যেয়ে কেউ কেউ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের উত্তর প্রদেশের দেরাদুনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়ে দেরাদুনে চলে যায়। এমনিভাবে বেশ কয়েকমাস প্রশিক্ষণের পর আমাদের বিচ্ছুবাহিনীর সামরিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে ভারত থেকে ও আমাদের এলাকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধের জন্য মানসিক, দৈহিক ও অস্ত্রসহ কৌশলগতভাবে প্রস্তুত হয়ে আমাদের মাঝে চলে আসে। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রগাঢ়তাও প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধ শহর নগর গঞ্জ ছেড়ে নীরেট গ্রামেরও ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শান্তি কমিটি ও রাজাকার আলবদর বাহিনী গঠন হওয়ার পর গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের জীবনও তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এমনই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে প্রকাশ্যে বা ক্যাম্প করে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা

সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাই আমাদেরকে প্রকাশ্যে চলাফেরার চাইতে গোপন আশ্রয়স্থলে থাকাই বেশী নিরাপদ বলে মনে হয়েছে। একদিকে সমতল ভূমি অন্যদিকে বিশাল বন্যা! সারা গ্রাম ডুবু ডুবু হয়ে গেছে। নৌকা বা কলাগাছের ভেরী ছাড়া পথ চলার কোন উপায় ছিল না। পায়ে চলতে কখনো হাটু পানি কখনো গলা পর্যন্ত পানি যা চলাচলের জন্য খুবই দূরূহ ও বিপদসঙ্কুল।
তাই গ্রামে গঞ্জে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়স্থল খোজার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। রাজশাহী বর্তমানের নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানা, বড়াই গ্রাম থানা, লালপুর থানা, বাগমারা থানা, নাটোর থানা, সিংড়া থানা ও পাবনা জেলার চাটমহর থানা এবং তাড়াশ থানা ও রায়গঞ্জ থানার (বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলা) বিভিন্ন গ্রামে স্বপক্ষীয় বাড়িতে বাড়িতে অতীব গোপনে বাছাই করে বিশ্বস্ত বাড়িতে গোপন আশ্রয়স্থল তৈরী বা ঠিকা হয়। এইসব গোপন আশ্রয়স্থলে মুক্তিযোদ্ধারা সামরিকভাবে কয়েকদিন করে আশ্রয় নিয়ে থাকত এবং অপারেশনের পর বা অপরারেশনের জন্য অন্য কোন আশ্রয়ে স্থানান্তরিত হত। আর আশ্রয়দাতারাই মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া দাওয়ার সব ব্যবস্থা করত।
আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আশ্রয়ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এমনি গোপন আশ্রয় ঠিক করার প্রচেষ্টা আমাদের চলতে থাকে। এমনি এক সময়ে গুরুদাসপুর থানার মশিন্দা ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের মোঃ নিজাম উদ্দিন আমার কাছে আসেন মাঝপড়ায় বেশ কয়েকটি গোপন আশ্রয়ের খোজ নিয়ে। নিজাম উদ্দিন তখন ঢাকা বুয়েটের ৩র্থ বর্ষের ছাত্র। এখন তিনি কানাডায় বসবাস করছেন। নিজাম উদ্দিন আমার চেয়ে দুই বছরের সিনিয়র। তাই তাকে বেশ সমীহ করতাম। তাকে সব সয়ই নিজাম ভাই বলেই ডাকতাম। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই তার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সখ্যতা গড়ে উঠে। তাছাড়া তিনি ঢাকায় বুয়েটে পড়তেন বলে তার অনেক পরামর্শ আমরা গুরুত্বসহকালে গ্রহণ করতাম।
নিজাম ভাইয়ের ঠিক করা শেল্টারগুলোর মধ্যেই মাঝপাড়ার এই এন্তাজ মিয়ার বাড়ি যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হবে বলে নিজাম ভাই দৃঢ়ভাবে আশ্বাস দিলেন। একদিন রাতে নিজাম ভাই আমাকের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তার ঠিক করা আশ্রয়গুলিতে। তার সাথে আমি ঐ সব বাড়িতে যেয়ে বাড়ির মালিকদের সাথে সাক্ষাৎ করি। আর এই সুযোগেই আমার পরিচয় মাঝপাড়ার এন্তাজ মিয়া ও তার স্ত্রীর সাথে। আমাদের দেখার প্রথম মূহুর্তেই যেন এন্তাজ মিয়া ও তার স্ত্রী আমাকে অতি আপন করে নিল। তারা শুনলো যে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বা বিচ্ছুবাহিনীর প্রধান। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন বাসায় রেখে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেই এবং অত্র এলাকার রাজাকার, শান্তি কমিটি ও মিলিটারীদের বিরুদ্ধে শসস্ত্র যুদ্ধ করি। তাই আমাকে কাছে পেয়ে যেন এন্তাজ মিয়া ও তার স্ত্রী আকাশে চাঁদ হাতে পেয়েছে। বুকে জড়িয়ে ধরে তারা উভয়েই আমাকে তাদের সন্তান হিসেবে সম্বোধন করতে করতে আনন্দে কেঁদে ফেললো। বাবা, ‘এতদিন ধরে আমরা তোমার মত ছেলের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমাদের কোন সন্তান নেই। আজ মহান আল-াতাআলা আমাদের এক যোগ্য সন্তান দিয়েছে। এখন আর আমাদের সন্তানহীনতার কোন দুঃখ নেই। তুমিই আমাদের সন্তান। আর তোমার বিচ্ছুবাহিনীর সবাই আমাদের সন্তান। আল-াহ কত মহান। আজ আল-াহ তোমার মত অনেক সাহসী সন্তান দিয়েছে যারা যুদ্ধ করে এই বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসর স্বাধীনতা বিরোধী দালালদের কব্জা থেকে মুক্ত করবে। আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তোমাদের যুদ্ধে সাহায্য করব। তোমাদের নিরাপদ আশ্রয় দিব। আমাদের জীবন দিয়েও তোমাদের জীবন রক্ষা করব। কেননা তোমরাই যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবে। আর আমরা তোমাদের নিরাপদে রেখে যুদ্ধ করার জন্য সব কিছুই করব। তোমার চিন্তা করো না। আমাদের এই বাড়ি আজ থেকে তোমাদেরই বাড়ি। গোপনে নিরাপদে তোমরা এখানেই থাকবে। তোমাদের খালা তোমাদেরকে নিজের সন্তানের মতই মায়ের আদর যত্নে তোমাদেরকে নিজের ঘরে আগলে রাখবে! ঐ রাতেই কিছু না খেয়ে আমাদেরকে আসতে দিলেন না। এখন থেকে এন্তাজ মিয়াকে খালুজান ও তার স্ত্রীকে খালা আম্মা বলে ডাকতে শুরু করি। আর এখন থেকেই এই বাড়ির সন্তানহীন এক চোখ অন্ধ নারী আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের খালা আম্মা হিসেবে পরিচিত হয়ে যায়। চলনবিলের নীরেট পল-ী এলাকা থেকে পদ্মা পারের ভারতের মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পর্যন্ত মাঝপাড়ার আছিয়া খালাকে মুক্তিযোদ্ধাদের খালা আম্মা বলে সবাই জানত এক বাক্যে।
আমি আশ্রয়স্থল ঠিক করতে আসব যেনে খালা আম্মা পূর্ব থেকেই আমাদের জন্য খাবার বিশেষ করে বিভিন্ন রকমের পিঠা তৈরী করে রেখেছিলেন। তার কথা, ‘বাবা, তোমরা মায়ের সন্তান মায়ের কোল ছেড়ে জীবন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে গ্রামে গঞ্জে দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করে বেড়াচ্ছ। কোথায় কি খাও বা না খেয়ে যুদ্ধ করছো। আর আমি তোমাদের মায়ের মত হয়ে তোমাদের না

খেয়ে রাখব? এটা কি করে হয়। তোমরা যেই আমার বাড়িতে আসবে আমার নিজের সন্তানের মতই এখানে নিরাপদে থাকবে ও মায়ের হাতের রান্না করা খাবার খাবে। তোমারা তোমাদের মায়ের মতই আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমাদের সব কিছু দিয়ে তোমাদের সেবা করব ও নিরাপদে রাখার চেষ্টা করব!

মায়ের মত আদরের কণ্ঠের খালাআম্মার আহবান শুনে আমিও অভিভূত হয়ে পড়লাম। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য তাদের সাহায্য কামনা করে খালা আম্মার তৈরী সুস্বাদু খাবার ও পিঠা খেয়ে সংগোপনে তাদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পরি নিজাম ভাইসহ কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে। এন্তাজ মিয়া যাকে এখন থেকে এন্তাজ খালু বা শুধু খালু বলে সম্বোধন করা শুরু করি তিনি তার ছোট ডেঙ্গি নৌকা করে আমাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেন।

কয়েকদিন পরই আমি কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে খালাআম্মার বাড়িতে উঠি। আমাদের আসার সম্পর্কে তাদেরকে পূর্ব থেকেই অবহিত করা হয়েছিল আমাদের তথ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে। আমরা ৬ জন গভীর রাত প্রায় ৩টার দিকে অতীব সন্তর্পণে খালা আম্মার বাসায় উঠি। খালা আম্মা ও খালুজান সারা রাত্রি জেগে আমাদের জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাদের বাড়িতে উঠার পরপরই খালাআম্মা তার হাতের রান্না করা অনেক রকমের খাবার খেতে দিলেন। ঘরের সকাল দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে চুপিচুপি আমরা তা আনন্দের সাথে খেয়ে নিলাম। খালা আম্মার শোবার একমাত্র কুড়ে ঘরে আমাদের ঘুমানোর ব্যবস্থা করলেও আমরা চৌকির নীচের কাঁথা পেয়ে শুইয়ে পড়ি। মূহূর্তের মধ্যে আমরা ঘুমিয়ে যাই। কিন্তু খালাআম্মা ও খালুজান পালা করে জেগে থাকেন আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। যদি কোন বিপদ আসার আভাস পান তাহলে তারা আমাদেরকে দ্রুত বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। এজন্য তাদের ছোট ডিঙ্গী নৌকা বাড়ির পিছনে কলাগাছের মাঝে লুকানো আছে। খালা আম্মা সারা রাত্রি জেগে নামাজ পড়ে আমাদের নিরাপত্তার জন্য ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আশু বিজয়ের জন্য দোয়া করে প্রতিদিন। সকাল দুপুর ও রাতে আমাদের জন্য খাবার তৈরী করে পাশে বসে থেকে মায়ের মত আদর করে খাওয়াতেন। খালুজানও তাদের বাড়ির গাছের নারিকেল ও পেয়ারা পেরে আমাদের খাওয়াতেন। তাদের আদর যত্ন ও আন্তারিকতার কোন অভাব ছিল না। মনে হত তাদের আদর যত্ন ভালবাসার সাথে সাথে তাদের সংসারের সকল সম্পত্তিই যেন তারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

খালা আম্মার বাসায় একদিন থেকে পরদিন রাত ১১টায় আমি অন্যদেরকে খালা আম্মার বাড়িতে রেখে চলে যাই আরো একদল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হতে এবং তাদেরকে আর এক আশ্রয়স্থলে পৌছে দিতে। আমাকে বিদায় দিতে খালাআম্মা কেঁদে ফেললেন। তার সব সময়ই ভয় কখন কোথায় যেয়ে কি বিপদে পরি। আর তখন খালাআম্মা নিজে আমার পাশে থাকতে পারবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি এইতো মুক্তিযোদ্ধার জীবন। রাত্রির গভীরে চলাচল ও দিনের আলোয় অন্ধকার ঘরে বন্দি। বিপদ তো প্রতি মূহূর্তেই আছে। যে কোন মূহুর্তেই আক্রমণ আসতে পারে। ধরা পড়তে পারি। যে কোন দিন যে কোন মূহুর্তেই আমাদের মৃত্যু হতে পারে। আর সেই মৃত্যুর ব্রত নিয়েইতো মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। যুদ্ধ করতে হলে তো আমাদের অনেককেই শহীদ হতে হবে। দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আমরা শহীদ না হলে আমাদের জয় হবে কি করে? পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশী দালালদের খপ্পর থেকে দেশকে স্বাধীন করব কি করে? তবুও যেন খালা আম্মার কান্না থামে না। শুধু বলে চলল, 'বাবা' খুব সাবধানে থেকো। রাস্তায় রাস্তায় রাজাকারদের চর ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিটারীদের হাতে ধরিয়ে দিতে ওরা হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর কারো ঘরে যুবতী মেয়ে বউ দেখলেই ওরা নাকি পাগল হয়ে যায় মিলিটারীদের হাতে মেয়েদের তুলে দিতে। এইতো সেদিনই ওরা কয়েকজন মেয়েকে কাছিকাটা থেকে ধরে নিয়ে মিলিটারী ক্যাম্পে দিয়ে এসেছে। আমি বললম, 'খালা আম্মা আমরাও তা শুনেছি। আর এসব বন্ধ করার জন্যই তো আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছি। মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি। যুদ্ধ করছি। খালা আম্মা আপনি শুনেননি যে গত পরশু আমাদের বিচ্ছুবাহিনীর এক অপারেশনে ঐ রাজাকার ও শান্তি কমিটির কয়েকজনকে খতম করা হয়েছে বাঙালি বোনদেরকে পাকিস্তানী মিলিটারীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। এই আপনার বাড়ির আশ্রয় দেয়া আপনার বাড়ির রান্না খাবার খাওয়া এই মুক্তিযোদ্ধারাই সেই অপারেশন করেছিল।

খালা আম্মা ও খালুজান যেন আকাশের সূর্য্যকে হাতে পেয়েছে। আমাদের জড়িয়ে ধরে তারা দুজনেই দোয়া করতে লাগল। বিজয়ের আশায় তাদের উভয়ের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। তারা বললেন, আল-াহ, 'তোমাদের আরো শক্তি ও সাহস দিক। তোমাদের সকল অপারেশনে তোমরা কামিয়াব হও।' অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও তারা জড়িয়ে ধরে দোয়া করতে লাগল। বলল,

‘বাবা, তোমরা মহৎ কাজ করছো। তোমাদের সব সময়ই জয় হোক। আল-াহ তোমাদের সেই তৌফিক দিক। আমরাও তোমাদের সাথে আছি। সারা বাংলার মানুষ তোমাদের সাথে আছে। বাংলার সকল মা বাবা তোমাদের জন্য দোয়া করছে। তোমরা এগিয়ে যাও। শত্রুদের খতম কর। এদেশ মুক্ত করো।’

বললাম, ‘খালা আম্মা আমাকে আর এক আশ্রয়ে যেতে হবে। আর একদল মুক্তিযোদ্ধা সেখানে অপেক্ষা করছে। তাদেরকে আর একটি অপারেশনের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিতে হবে। খালা আম্মা খালুজানকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তুমি আমার ছেলেকে নিরাপদে তার আর এক আশ্রয়ে পৌছে দিয়ে এসো। দেখো, আমার ছেলের যেন কোন ক্ষতি না হয়।’ আমার মাথায় মায়ের মত আদরে হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন। আমিও খালুজান ধীরে ধীরে তাদের ছোট ডিঙ্গী নৌকায় উঠে পড়লাম। খালা আম্মা মুখে কাপড় চেপে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন।

আর একটি আশ্রয়ে যাওয়ার পথে অপেক্ষা করা আমার কায়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করি ও খালুজানকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলি। কয়েক দিন পরই তার বাড়ি থেকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অন্য এক আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর কয়েকদিন পরেই অন্য কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের আশ্রয়ে পাঠানো হবে।

এইভাবেই চলতে থাকে এন্তাজ মিয়া খালুজানও তার স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের খালা আম্মার বাড়িতে আমাদের বিচ্ছুবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ গোপন আশ্রয়স্থলে থাকার ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। কখনো এক সপ্তাহ কখনো দুই সপ্তাহ পরপর তাদের বাড়িতে পাচ ছয় জন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হত। আর খালা আম্মা খালুজান সবাইকেই তাদের অন্তর থেকে সকল আদর যত্ন উজার করে দিয়ে নিরাপদে রাখার ও খাওয়ানোর সকল ব্যবস্থা করেছেন। যে মুক্তিযোদ্ধাই একবার খালা আম্মার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে সে খালা আম্মা ও খালুজানের আদর যত্নের কথা কোনদিন ভুলি নি। সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই যেন তারা আপন সন্তানের মত আদর যত্ন করে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা ও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। অতীব গর্বের সাথে তারা এই মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা যত্ন করে যেতেন।

এমনিভাবে এই আছিয়া খালার বাড়িতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত যাতায়াত চলতে থাকলো বেশ কয়েক মাস ধরে। অনেক মুক্তিযোদ্ধারা এই বাড়িতে নিরাপদে থেকেছে ও খাওয়া দাওয়া করেছে। আছিয়া খালা ও তার স্বামী এন্তাজ খালুও কখনও বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা যত্ন করার জন্য এতই আগ্রহ ছিল যে যদি কোন সপ্তাহে তাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের না পাঠাতাম আছিয়া খালা ভীষণ মন খারাপ করে থাকতেন। খাওয়া দাওয়া করতেন না এবং যাদেরকে আদর যত্ন করে আশ্রয় দিয়ে খাইয়েছেন তাদের নিরাপত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের জন্য সব সময়ই নামাজ পড়ে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতনে। অনেক সময় তার স্বামীকে আমার খোজে পাঠিয়ে দিতেন জানার জন্য যে তখন তার বাড়িতে তার সন্তানতুল্য মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠাবো। তার স্বামী এন্তাজ খালু এসে আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন যে বাবা, ‘তোমার খালাতো তার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের খাওয়াতে না পেরে নিজেই খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তুমি কিছু করো বাবা। মাঝে মাঝে কাউকে না কাউকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। তোমার খালারতো কোন সন্তান নেই। তোমরা মুক্তিযোদ্ধারাই তার সন্তান। তাই সন্তানদের না দেখে সে থাকতে পারে না! আছিয়া খালা খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে জেনে আমি নিজেই ঐ রাতে তাদের বাড়িতে গেলাম। আছিয়া খালাতো রাগে অভিমানে আমার উপর ক্ষেপে আছে। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। ‘আমরা তাকে ভুলে গেছি। আমরা আর তার সন্তান হতে চাই না।’ এরকম কত অভিযোগ তার। অবশেষে রাগ ভাঙ্গিয়ে অনেক আদর যত্ন করে খাওয়ালো। আবার কবে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানেরা তার বাড়িতে আসবে, বার বার তার সেই একই প্রশ্ন। তাড়াতাড়ি তার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের না দেখলে সে না খেয়েই কেঁদে কেঁদে মারা যাবে। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলাম। বললাম, ‘খালা আর কয়েকদিন পরই ইন্ডিয়া থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আসছে। এরা সবাই ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও বড় ছাত্রনেতা। ইন্ডিয়ার দেরাদুন থেকে এরা অনেক উচ্চ প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছে। তাই এদের জন্য খুব নিরাপদ আশ্রয় স্থল দরকার। আছিয়া খালাতো আকাশে তারা যেন হাতে পেল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘বাবা, আমার বাড়িতে ওদের নিয়ে এসো, একদিনের জন্য হলেও আমি ওদের সেবা করতে চাই। ওরা কতদিন যে মায়ের হাতের রান্না খায়নি। কতদিন যে মায়ের পরশ পায়নি। আমি ওদের মায়ের ছোঁয়া দিব। তুমি বাবা আমাকে ফাঁকি দিবে না।’ আছিয়া খালাকে অনেক কথা বলে আশ্বস্থ করে আমি সে রাতেই আবার অন্য এক আশ্রয়স্থলে চলে আসি। আর মনে মনে ভাবি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মায়ের কোন অভাব নেই। মায়ের

আদরের কোন শেষ নেই। বাংলার ঘরে ঘরে আমাদের লক্ষ লক্ষ মা এমনিভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করছে। আমাদের নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করছে। আমাদের জন্য বুক উজার করে মায়ের আদর যত্ন বিলিয়ে দিচ্ছে আর খাবার তৈরী করে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়ানোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আর এমনি আপন করা পাগল পরা মাদের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের আর ভয় কিসের। লক্ষ মায়ের আদর ও দোয়া মাথায় নিয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে আমাদের বুক কখনো কাঁপবে না। আমাদের সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাই লক্ষ লক্ষ মায়ের আর্শীবাদে ধন্য পুষ্ঠ হয়ে অভয় চিত্তে যুদ্ধে বিজয় অবশ্যই ছিনিয়ে আনবে। এমন মায়ের সন্তানদের বিজয়ই হবে একমাত্র লক্ষ।

কয়েকদিন পরেই ১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট ইন্ডিয়ার দেরাদুন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আমি নিয়ে আসি। ২১ আগস্টে আমরা পদ্মার ওপারে মুর্শিদাবাদের সাহেবরামপুর থেকে নৌকায় বিশাল পদ্মা পারি দিয়ে লালপুরে আসি। রাজশাহী শহরের দিকে অর্ধেক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের জাহাঙ্গীর ভাই ও মাহফুজ ভাইয়ের নেতৃত্বে পাঠিয়ে দেই। অবশিষ্ট অর্ধেক সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে আমি নাটোরের দিকে চলে আছি। লালপুর ও বড়াই গ্রামে কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে আর কয়েকজনকে নিয়ে গুরুদাসপুর থানা চলে আসি। পথে কয়েক আশ্রয় অবস্থান নিয়ে অবশেষে ৩০ আগস্টে এসে মশিন্দা মাঝপাড়ায় এসে পৌঁছি। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা নিজাম ভাই ও সাত্তারসহ বেশ কয়েকজন আমাদেরকে গোপনে গ্রহণ করে। রাত প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা আগে থেকেই ঠিক করা আছিয়া খালার বাড়িতে এসে হাজির হই। আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুতো সারা রাত জেগে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের পেয়েই তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন তারা। আমাদের সবার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর ও আর্শিবাদ করলেন। খালা ও খালুর সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেই। তাদের মধ্যে নাটোর মহকুমা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান রেজা ও নাটোর নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলেজের ছাত্র সংসদের সহসভাপতি রঞ্জু ছিল অন্যতম। এরা সবাই দেরাদুন থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা।

আছিয়া খালার কুঁড়ে ঘরের মাচাঙ্গের নীচে হাঁড়ি পাতিল আর বস্তা দিয়ে আড়াল করা জায়গায় বিছানো কাঁথায় আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। আমরা সবাই অতি ক্লান্ত। বড়াইগ্রাম থেকে প্রায় ৩০ মাইল কখনো নৌকায় কখনো এক বুক পানি পেড়িয়ে সারা দেহ ভিজায়ে কচুর দাম, পথের কাঁটা পেরিয়ে রাত ১০টার পর থেকে সাড়ে তিনটায় এসে পৌঁছেছি। ক্লান্ত দেহে তাই শোয়া মাত্রই আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন প্রায় দুপুরের দিকে আমরা ঘুম থেকে উঠি। আমাদের দিনে বাইরে বের হওয়া নিষেধ। তাই এই ঘরের মধ্যে গর্ত করে আমাদের পায়খানা প্রশ্রাবও গোছলের কাজ কোন মতে সারতে হত। সাধারণত গামছা ঝিবিয়ে গা মোছাই ছিল আমাদের গোছলের বিকল্প। আছিয়া খালা আমাদের ফেলে আসা আবর্জনা পরিস্কার করতেন।

ঘুম থেকে উঠেই দেখি আছিয়া খালা খাবার নিয়ে ঘরের ভিতর রেখে দিয়েছে এবং নিজে দরজার পাশে বসে আমাদের পাহারা দিচ্ছে। এন্তাজ খালু তখন কিছুটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর আছিয়া খালা ঘুমাবে। এইভাবেই পালা করে তারা একজন ঘুমাতো আর একজন জেগে থেকে আমাদের পাহারা দিত। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বাড়িতে আসলেই তাদের সংসারের সকল কাজ বন্ধ হয়ে যেত।

গ্রামের কুঁড়ে ঘরের বাড়ি। গ্রামের অনেকেই বাড়ির আশপাশ দিয়ে চলাফেরা করত। তাই দিনে আকার ইঙ্গিত ছাড়া কোন কথা বলা বা ফিসফাস করাও ছিল সম্পূর্ণ নিষেধ। দিনে আশ্রয়তাদাতের সাথে আমাদের কোন কথা হয় না। আকার ইঙ্গিতেই আমাদের সকল প্রয়োজন মেটাতে হতো। আশ্রয়দাতাদের পূর্ব থেকেই আমরা সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে রাখতাম। আর আছিয়া খালা এবিষয়ে এক দাপ এগিয়ে ছিল বলতে গেলে। তাদের বাড়িতে থাকা অবস্থায় আমাদের কি কি লাগবে সব কিছুই সে ঠিক করে রাখত যেন আমাদের কিছুই কইতে না হয়। এমন কি ফিস ফাস বা ইঙ্গিত যেন করতে না হয়। কোন ধরনের খাবার পানি, গোছলের পানি, পায়খানা ও প্রশ্রাবের ব্যবস্থা সবই করে রাখতেন তিনি আমাদের জন্য। তাই আমাদেরকেও আর আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুকে কোন প্রয়োজনে কিছু বলার অবকাশ থাকত না।

৩১ আগস্টের দিন শেষে রাত ১০টার দিকে আমি অন্যদেরকে রেখে অন্য আশ্রয়স্থলের সন্ধানে আছিয়া খালার বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি খালা ও খালুকে বিকল্প আশ্রয়ের কথা বলে। যদি কোন বিপদ হয় তাহলে ঐ আশ্রয়স্থল ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজন হলে। আছিয়া খালা তা ভাল করেই জানেন এবং বিকল্প আশ্রয়ের সাথে এক গোপন যোগযোগও স্থাপন করা হয়েছে। আমি চলে আসার সময় আছিয়া খালা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া আর্শিবাদ করে দিলেন আর বললেন, 'বাবা, তুমি চিন্তা করো না,

আমরা জীবন দিয়েও আমার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জীবন রক্ষা করব। ওদের বাঁচাতেই হবে যে। ওরাইতো দেশকে স্বাধীন করবে যুদ্ধ করে। আমরা মরেও ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখব।' আবারও এন্তাজ খালুকে নিরাপদে আমার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দিতে বলে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমিও আমার সঙ্গীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে এবং বিপদ আসলে প্রয়োজনে বিকল্প নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলে চলে যাই।

পরদিন জানতে পারলাম যে আছিয়া খালার বাড়িতে শত্রুর আক্রমণ হয়েছে। কেউ হয়ত এই বাড়ির উপর অনেকদিন থেকেই নজর রেখেছিল। ১ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই আছিয়া খালার বাড়ির আশপাশ দিয়ে কিছু লোক বারবার যাতায়াত করছিল। কখনো বাড়ির দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিচ্ছে। কখনো আবার ঘরের বেড়ার পাশে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। তার বাড়ির পাশ দিয়ে এমন করে লোকের আনাগোনা ও উৎপেতে থাকা আর কখনো দেখেনি। ওদের দুএজনকে আছিয়া খালা চিনতেও পেরেছে। তারা যে মুক্তিযুদ্ধের শত্রু পক্ষ তা খালা বুঝে উঠতে পেরেছে। এন্তাজ খালু সারা রাত জেগে পাহারা দিয়ে কেবলি ঘুমিয়ে পড়েছে। খালা তাড়াতাড়ি খালুকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করল আশু মহা বিপদের কথা। খালু হতভম্ব হয়ে জেগে উঠল। খালার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সেও ভীত হয়ে পড়ল মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের জন্য। তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে ঘুমন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের উঠালেন এবং ইঙ্গিতে সমূহ মহা বিপদের আভাস দিলেন। মুক্তিযোদ্ধারা চুপি চুপি উঠে নিজেদেরকে গুছিয়ে নিল। তারা প্রস্তুত হয়ে গেল হয় যুদ্ধ করতে হবে না হয় চুপিসারে সরে বিকল্প আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যা করণীয় তা করার জন্য ওরা প্রস্তুত হয়ে গেল। ওরা ইঙ্গিতে খালা ও খালু বোঝালো যে লোকজন সরে গেলে প্রথমে তারা দ্রুত বিকল্প আশ্রয়ে চলে যাবে। পথে ধরা পরার পরিস্থিতি হলে তারা সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করবে। খালার শুধু ভয় তার সন্তানতুল্য মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন নিয়ে। কি করে তাদের নিরাপদে অন্য আশ্রয়ে পৌছিয়ে দিবে। মনে মনে দোয়া পড়ছে আর বেড়ার ফাক দিয়ে লোকজনের আনাগোনার অবস্থা দেখছে। নিরাপদ পরিবেশ পাওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। আর এরই মধ্যে আছিয়া খালার ভয়ে সারা শরীর ঘেমে গেল।

লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে বাড়ির পাশ দিয়ে আনাগোনা করে হয়ত কিছু টের পেয়েছে। হয়ত বা সন্দেহ করেছে। হয়ত বা তারা এখন রাজাকার ক্যাম্পে খবর দিতে গেছে। এরকম বহু চিন্তায় আছিয়া খালার দেহে যেন আর প্রাণ নেই। এন্তাজ খালুকে সে বলল, 'এখনই সময়। আমার ছেলেদেরকে এখনই নিরাপদ স্থানে রেখে এসো। ঐ শত্রুরা হয়ত রাজাকার ক্যাম্পে খবর দিতে গেছে। রাজাকারদের আসতে কিছু সময় লাগবে। কাছিকাটা বাজারে ওরা আছে। এই সুযোগেই আমার ছেলেদের নিয়ে যাও, আর এক আশ্রয়ে।' খালা প্রায় উম্মাদের মত কথাগুলো বলে তার স্বামীর হাত ধরে টানতে লাগল। আর মুক্তিযোদ্ধাদের বল, 'বাবা, আজ আমি তোমাদের জোড় করেই বাড়ি থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। জানি না আর দেখা হবে কিনা। তবে বিপদ চলে গেলে আবার তোমাদের এই মায়ের ঘরে নিয়ে আসব। এখন বাবা তোমরা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়। তোমাদের খালু তোমাদেরকে পৌছিয়ে দিবে আর এক আশ্রয়ে।'

মুক্তিযোদ্ধারা বলল, 'খালা, আপনারাও আমাদের সঙ্গে চলেন। তা না হলে আপনাদেরও ওরা হয়ত ধরে নিয়ে যাবে।' খালা বলল, 'না বাবা, আমাদের না দেখলে ওরা আরো বেশী সন্দেহ করবে, বাড়ি পুড়িয়ে দিবে এবং তোমাদের ধরার জন্য এই এলাকায় সব বাড়িতে বাড়িতে তল-াশী করবে। তখন আবার তোমাদের ধরে ফেলবে। এখন আর দেরী করো না। তাড়াতাড়ি চলে যাও,' বলে আছিয়া খালা কান্দতে লাগল। মুক্তিযোদ্ধাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে দোয়া ও আর্শিবাদ দিয়ে বিদায় দিলেন।

এন্তাজ খালু বাড়ির পিছন দিকের কলার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে তার ছোট্ট নৌকায় করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গেলেন আর এক বিকল্প আশ্রয়ে। আছিয়া খালা তখন শোবার ঘর ছেড়ে রান্না ঘরে কাঁথা নিয়ে বসে পড়লেন ও নামাজ পরে দোয়া করতে লাগলেন তার সন্তানতূল্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপত্তার জন্য। মাঝে মাঝে কোরআন শরীফও তেলায়াত করতে থাকেন। আর অপেক্ষা করছেন কখন তার স্বামী মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। তখন হয়ত সে একটু শান্তি পাবে। তার যেন আর সময় কাটে না। নামাজ পড়া ও কোরআন তেলায়াতের মাঝে মাঝে উঠে রান্না ঘরের বেড়ার ফাক দিয়ে দেখে যে তার স্বামী ফিরে আসছে কিনা।

এদিকে হঠাৎ বাইরে গোলাগুলির প্রচন্ড শব্দ হতে লাগল। আছিয়া খালার ধরে বুঝি আর জান নাই। হয়ত পথেই মুক্তিযোদ্ধাদের ওরা আক্রমণ করেছে। ভয়ে তার সারা দেহ শিউরে উঠেছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দোয়া দরুদ পড়তে পারছে না। মুখ দিয়ে

কোন কথা বেরুচ্ছে না। চিৎকার করে কান্নার ইচ্ছে করলেও গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। তার দুনিয়া যেন আজ এই মূহুর্তে ওলট পালট হয়ে গেল। হয়ত তার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানেরা এতক্ষণ শহীদ হয়ে গেছে। এই সব অলোক্ষণের কথা চিন্তা করতে করতেই হঠাৎ তার রান্না ঘরের দরজা ভেঙ্গে পড়লো কাদের যেন সজোড় লাথিতে। ভেঙ্গে পরার দরজার এক অংশ তার পায়ের উপর পড়তেই আছিয়া খালাও মেঝেতে পরে গেলেন। উঁহ, করে আবার নিজের মুখ নিজেই শাড়ীর আঁচল দিয়ে চেপে ধরেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন রাজাকার রান্না ঘরে ঢুকে আছিয়া খালার উপর ঝাঁপিয়ে পরে। মূহুর্তের মধ্যে তাকে চ্যাঙ্গ দোলা করে উঠানে নিয়ে আসে এবং তার দুই হাত পিছনে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে। এদিকে কিছু রাজাকার তার শোবার ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভিতর খুঁজে খুঁজে তচনচ করতে লাগল।

রাজাকাররা বার বার চিৎকার করে বলে চলল, 'হারামজাদী মাগী, তোরা কানাকানি দেশটাকে ধ্বংস করলি। এই কানি, তোর কানা সোয়ামী কই? এন্তাজ কানা কই? বাইরে থেকে আসা মুক্তিযোদ্ধা নামের তোর দেহ ব্যবসার লোকেরা কই। বল, ওদের কোথায় রেখেছিস।' এমনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে লাঠি দিয়ে আছিয়া খালার মাথা, পিঠে ও সারা দেহে আঘাত করতে লাগল। আছিয়া খালার মুখে কোন কথা নেই। সে যেন নির্বাক হয়ে গেছে। চিৎকার করে রাজাকারদের গালি দিতে চাইলেও যেন তার কণ্ঠ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না।

এদিকে এন্তাজ খালু মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য আশ্রয়ে রেখে বাড়িতে এসে দেখে যে তাদের উপর গজব নাজিল হয়ে গেছে। তার প্রাণপ্রিয় বউকে পিঠমোড়া দিয়ে বেধে রেখেছে। বেধমভাবে প্রহার করছে। বউয়ের শরীর আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে ও রক্ত ঝড়ছে। এন্তাজ খালুর আর সহ্য হল না। রাগে দুঃখে ক্ষোভে তার মাথায়ও রক্ত চেপেছে। সন্তানতূল্য মুক্তিযোদ্ধাদের অন্য আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে এসে সে এখন নিজেই মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছে। তাই 'জয় বাংলা' বলে গগন ফাটানো চিৎকার দিয়ে তার নৌকার লগি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজাকারদের উপর। লগির আঘাতে কয়েকজন রাজাকারের মাথায় সজোরে আঘাত করে রক্ত ঝড়িয়ে দিল।

স্বামীকে দেখেই আছিয়া খালা প্রথমে একটু আশ্বস্থ হলেন এইভেবে যে তার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের অন্য আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পেরেছে। কিন্তু তার এই বিপদের মূহুর্তে স্বামীকে পেয়ে কিছুটা সাহস পেলেও তার স্বামীর বিপদের আশঙ্কার কথা ভেবে সে ভয়ে আঁতকে উঠল। সে চায় না তার স্বামী রাজাকাদের হাতে নির্যাতিত হোক। মৃত্যুর কথাতো চিন্তাই করতে পারছে না। সে চায় তার স্বামী পালিয়ে যাক। অন্তত একজন বাঁচলে তাদের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সাহায্য করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য। তাই স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে চিৎকারে করে বলার চেষ্টা করছে যে, 'তুমি পালিয়ে যাও।' কিন্তু তার কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। তার দুই হাতই পিছনে বাঁধা। তাই হাতের ইঙ্গিত করতে পারছে না। কোন মতে অস্পষ্ট শব্দে ও চোখের ইশারায় এবং মুখের ভঙ্গিতে তার স্বামীকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বুঝাতে চেষ্টা করছে। কেননা এতগুলো রাজাকারদের সাথে সে পেরে উঠবে না। তাকেও ওরা মেরে ফেলবে। নিজের জীবনের প্রতি তার আর আশা নেই। তাকে হয়ত রাজাকারা মেরেই ফেলে দিবে। এন্তাজ খালু কয়েকজন রাজাকারকে লাথি দিয়ে পরাস্ত করে আছিয়া খালার কাছে যেয়ে তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে উদ্ধত হলেই পিছন থেকে এক রাজাকারের রাইফেলের বাটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজাকারা তখন তাকেও পিঠ মোড়া করে বেঁধে ফেললো আর বেধমভাবে তাকে মাথায়, পিঠে ও সারা দেহে আঘাত করতে লাগল। এন্তাজ খালুরও মাথা পেঠে রক্ত বেরুতে লাগল। স্বামীর অবস্থা দেখে আছিয়া খালা যেন অজ্ঞানের মত হয়ে গেল। রাজাকারেরা প্রথমে বলল, 'মুক্তিযোদ্ধাদের কোথায় রেখে এসেছিস।' এন্তাজ খালুর মুখেও কোন কথা নেই। নিজেদের জীবন গেলেও সে মুক্তিযোদ্ধাদের কোন খবর দিবে না। তাই যতই আঘাত করছে তার মুখে কোন শব্দ বের হচ্ছে না।

এরমধ্যেই দুই জন রাজাকার তাদের শোবার ঘর থেকে বের হয়ে রাইফেলের কিছু গুলি নিয়ে এসে বলল, 'এই দেখ এখানে মুক্তিযোদ্ধারা লুকিয়ে ছিল।' এই হারামজাদা কানা আর হারামজাদী মাগী ওদেরকে লুকিয়ে রেখেছিল। আমাদের আসার খবর পেয়েই হয়ত কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে। ওরা সবই জানে। এই পাকিস্তান ধ্বংসকারীদের ভারতের দালালদের খতম কর। ওদের আরো পিঠাও, তাহলেই বলবে কোথায় মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে এসেছে। এন্তাজ খালুর দেহের ওপর আঘাতের পর আঘাত পড়তে থাকলো। প্রায় চার পাঁচজন রাজাকারা সাপ মারার মত মেরে চলেছে। এন্তাজ খালু চিৎকার করে বলছে তোমরা আমাকে মেরে ফেরতে পারো। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কোন কথা সে জানে না। বলতে পারবে না। আছিয়া খালা স্বামীর উপর রাজাকারদের

নির্যাতন আর যেন সহ্য করতে পারছে না। শুকনো ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, 'তোমরা আমার স্বামীকে মেরো না- আঘাতগুলো তোমরা আমাকে দাও। আমাদের মেরে ফেলো তবুও তোমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের কিছুই জানবে না। ওরা বিচ্ছু, ওরা বেঁচে থাকবে, তোমাদের খতম করবে আর এই দেশকে স্বাধীন করবে।'

রাজাকাররা আরো ক্ষেপে উঠল। একজন বলতে লাগল, 'এই বাজা কানা মাগী, তোর তো পেটে বাচ্ছা ধরে না। তোর আবার ছেলে আছে কি করে? বল কোথা থেকে তাদের নিয়ে এসেছিস।' একজন বলল 'এই মাগীরে নিয়ে চল মিলিটারীদের ক্যাম্পে। পাকিস্তানী মিলিটারীদের আঘাত পেলেই সব বলে দিবে।' আর একজন বলল, 'নারে, এই বুড়ী মাগীকে নিয়ে গেলে মিলিটারীরা আমাদেরই মারবে। ওরা চায় যৌবনবতী মেয়েদের।' আর একজন বলল, 'আয়, আমরাই দেখি এ মাগীর পেটে বাচ্চা ধরাতে পারি কিনা। এই বলে আছিয়া খালার পরনের কাপড় একে একে টেনে ছিড়তে লাগল দুইজন রাজাকার। ওদের এহেন জঘন্য অমানবিক নির্যাতনে স্বামী স্ত্রী দুই জনেই আকাশ ফাটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। আর রাজাকাররা মহা অট্টহাসিতে উম্মাদ হয়ে উঠল। এক রাজাকার বলল, 'এখনো বল, মুক্তিযোদ্ধাদের কোথায় রেখে এসেছিস। তা না হলে তোদের দুজনকেই উলঙ্গ করে স্বামীর সামনে স্ত্রীর ইজ্জতহানি করব। আর উলঙ্গ করে এই গাছে বেঁধে তোদের হত্যা করব।'

তবুও দুইজনের মুখ খুলল না। এদিকে দুইজন রাজাকার ইতিমধ্যেই আছিয়া খালাকে বিবস্ত্র করে মাটির ওপর ঠেসে ধরেছে আর তার স্বামীকে বলছে, 'এখনও বল, নইলে তোর চোখের সামনে তোর স্ত্রীকে সবাই মিলে ধর্ষণ করব। এন্তাজ খালুতো চিৎকার করে বলছে, হ্যায় আল-াহ, তুমি তোমার দুই চোখই অন্ধ করে দিলে না কেন? তা হলে তো এমন নিষ্ঠুর নির্মম জঘন্য পাপ কাজ দেখতে হতো না। আমার স্ত্রীর বেইজ্জতী হওয়ার আগেই আমাকে মৃত্যু দাও। হ্যায় আল-াহ, 'এই অত্যাচারী নির্যাতনকারী রাজাকার পাকিস্তানী দালালদের খতম করে এই দেশকে স্বাধীন করে প্রতিশোধ নাও। মুক্তিযোদ্ধাদের সেই তৌফিক দাও।' এই বলতে বলতে রাজাকারের লাঠির আর এক আঘাতেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আশেপাশের লোকজন যেন তাদের কাছে ভিড়তে না পারে সেজন্য রাজাকারেরা এই বাড়িতে আসার প্রথম থেকেই মাঝে মাঝে ফাঁকা গুলি ছুটছে। ভয়ে পাড়ার কেহ এদের দেখতেও আসতে পারছেন না। অনেকেই বহু দূর থেকে দেখার চেষ্টা করছে। আর রাজাকারেরা চিৎকার করে বলছে আশেপাশের লোকদের শোনানোর জন্য যে, 'দেখ, ভারতের দালালদের কি পরিণতি হয়। এখনো সবাইকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি যে, কেউ যেন কোন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় না দেয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কোন খবর জানলেই তোমরা আমাদের সংবাদ দিবে। তা না হলে তোমাদের পরিণতিও এরকমই হবে। কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।' আছিয়া খালা হাত পা দিয়ে সজোরে আঘাত করে রাজাকারদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ক'জন রাজাকার ততক্ষণে তার উপর কুকুরের মত পাশবিক নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে। গগন বিদারী চিৎকার দিতে দিতে এক সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আছিয়া খালা আম্মা নিস্তেজ হয়ে গেল। তার দেহে আর কোন অনুভূতি রইল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আর তার সন্তান বয়সী রাজাকারেরা পথের ন্যাকরে কুকুরের মত খাবলে খাবলে যেন বাংলা মাকে খেয়ে চলল। মহা অট্টহাসিতে এই পাকিস্তানী দালাল রাজাকারের অসহায় এক বাংলা মায়ের ইজ্জতহানি করে তাকে হত্যা করে মহা তৃপ্তি অনুভব করে চলল।

রাজাকার শয়তানেরা আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুর নিথর দেহ দু'টি রশি দিয়ে বেঁধে তাদের নাড়িকেল গাছের সাথে দাঁড় করিয়ে বেধ ফেলল। ওদের মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য তারা রাইফেলের এক গুলিতে দুইজনেরই বুক ভেদ করে মহান এই নির্ভীক দুই মুক্তিযোদ্ধাকে শহীদি দরজায় পৌঁছে দিল।

আছিয়া খালার বাড়িতে রাজাকারদের হামলার খবর বেশ কয়েক ঘন্টা পর আমরা জানতে পারি। তখনই এক দল মুক্তিবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয় আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুকে এবং তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করতে। কিন্তু ততক্ষণে রাজাকারেরা তাদের মানব সভ্যতার জঘন্যতম কাজ শেষে এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। তবে মানুষ রূপী এই রাজাকার শয়তানেরা যে এত জঘন্য নিষ্ঠুর কাজ করবে তা এর আগে কখনো বুঝে উঠতে পারেনি। পরবর্তীতে এসব খবর জানতে পেরে আমরাও যেন মূর্ছা গেলাম। আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুর আত্মত্যাগের কাছে আমাদের ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।

মানব সভ্যতার জঘন্যতম সৃষ্টি এই রাজাকারেরা পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার জন্য নিজের মা বোনদের অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে ইজ্জতহানী করে ও হত্যা করে মহা তৃপ্তি পায় আর পরকালে বেহেস্তের টিকেট অর্জন করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে এই হায়ানার দল লক্ষ লক্ষ বাঙালি মা বোনদের এমনিভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। আর পুরুষদের হত্যা

করেছে কুপিয়ে কুপিয়ে। এরাই সেই ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষাকারী মহাপাপী মানুষরূপী জানোয়ার।

আজও প্রতি মূহুর্তে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুর কথা মনে পড়ে। তাদের পবিত্র রক্তের কাছে শুধু আমরাই নই স্বাধীন বাংলাদেশের সকল জনতা ও ভবিষ্যত বংশধর চিরদিন ধরে ঋণী হয়ে থাকবে। তাদের ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবনা। আজও আছিয়া খালার অদৃশ্য স্পর্শ যেন আমি অনুভব করি। তার স্পর্শে মায়ে ছোয়া পাই, জীবনে নতুন অর্থ খুজে পাই, তাদের দোয়া আর ঢেলে দেয়া রক্ত আজও আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। জননীতূল্য আছিয়া খালাকে সেই দিন সেই মুহূর্তে আমরা অস্ত্র হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিচ্ছু বাহিনী হয়েও শয়তান রাজাকারদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি। আমাদের এই চরম ব্যর্থতার জন্য আছিয়া খালা ও এন্তাজ খালুর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। তাদের পরম সর্গীয় আত্মার কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী। তোমরা আমাদের ক্ষমা করো।